চোত-বোশেখের পাবন কথা

পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥উৎসর্গ॥

গুরুর চরণধূলি নিয়ে
মনমুকুর মালিন্যমুক্ত,
জগন্মাতার মহিমা গাই
সন্তান তাঁর অনুরক্ত।

“সদ্গুরুরূপী ঈশ্বরী শ্রীশ্রীমা সর্বাণীর পুতরাঙাপাদপদ্মে এই গ্রন্থটি নিবেদিত হল মাতৃচরণাশ্রীতা পম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যে জগৎজননীর সতত কৃপা ও অমৃতকরুণাধারা ব্যতীত আমার লেখা সম্ভবই ছিল না।

জয় শ্রীশ্রী মা সর্বাণী, জয় গুরুমহারাজগণ।

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
রাম পরাতত্ত্ব	৪
অশোকষষ্ঠী ও অশোকাষ্টমী	১৫
নীলঘরের বাতি	২১

॥রাম পরাতত্ত্ব॥

সামনে রামনবমী, রামচন্দ্রের জন্মতিথি, সাধক, জ্ঞানী, যোগী, সংসারী সকলের সাধ্য ইষ্ট সেই পরমাত্মাস্বরূপ আত্মজ্যোতি রাম, তাই রামের পরাতত্ত্বতে একটু আলোকপাত করার প্রয়াস।

রামাষ্টকম মন্ত্রটি এরকম :

হে রাম পুরুষোত্তম নরহরে নারায়ণ কেশবা,
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজা গুণনিধে দামোদরা মাধবা।
হে কৃষ্ণ কমলাপতে যদুপতে সীতাপতে শ্রীপতে
বৈকুণ্ঠাধিপতে চরাচরপতে লক্ষ্মীপতে পাহিমাম।

রামের চেয়েও বড় রামনাম, "রামসে বড়া হ্যায় রামকা নাম" এহেন কথা আমরা শুনেই থাকি, বাঙ্গালী সেটা বিশ্বাস কমই করে বিশেষ করে রামনামে তার বেশ অভক্তি কিন্তু গোস্বামী তুলসীদাসজি ভগবান শ্রীরাম নামের মহিমা কতটা বর্ণনা করেছেন সে বিষয়ে একটু আলোচনায় ব্রতী হলাম। কেন তুলসীদাসজীর কথা..কারণ এযুগে রামকথা এতো মধুরভাবে আর কেউ পরিবেশন করেননি যা আসমুদ্রহিমাচলে সমাদৃত, না না, কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণকে বিশেষ মূল্য দিয়ে বললেও তুলসীদাসজীর মধুর রসের পরিবেশনাকে মাথায় তুলে রাখতেই হবে তাঁর সার্বজনীন গ্রহনযোগ্যতার জন্য, কৃত্তিবাসজি শুধুই বাঙ্গালীর, বাংলার, তিনিও বলছেন:

"শমণ দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।
শমণ ভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥"

আবার রামচন্দ্রের জন্মের আগে আবাহন করছেন তুলসীদাসজী এভাবে :

জয় জয় সুরনায়ক জনসুখদায়ক প্রণতপাল ভগবন্তা,
গো-দ্বিজ-হিতকরী জয় অসুরারি সিন্ধুসূতা প্রিয়কান্তা।
পালন সুরধরণী অদ্ভুত করণি মরম না জানে কোই,
জো সহজ কৃপালা দীনদয়ালা করহু অনুগ্রহ সোই,
জয় জয় অবিনাসি সব ঘটবাসী ব্যাপক পরমানন্দা,
অবিগত গোতিতম চরিত মুনিতম মায়ারহিত মুকুন্দা।
যেহি লাগি বিরাগী অতি অনুরাগী বিগত মহামুনি বৃন্দা,
নিসি বাসর ধ্যাবহি গুনগান গাবহি জয়তী সচ্চিদানন্দা।

এই স্তব গাইছেন সব মুনিঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে মর্ত্যলোকে আবাহন করতে তাঁর অবতরণের জন্য যখন দুষ্টের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়েছে-যা তুলসীদাসী রামায়ণের প্রথমেই পাওয়া যায়।

রাম - এই নামের অর্থ এবং যৌক্তিকতা কি? জ্যোতিষ মতে, 'শ্রী রাম' মানে ভগবান শ্রীরামকে ডাকা। এটি ভগবান রামের আহ্বান। 'জয় রাম'-এই তার প্রশংসা, 'জয় জয় রাম'-এটি তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। প্রতিদিন ভগবান শ্রীরামের মন্ত্র জপ করলে কাঙ্খিত ইচ্ছা পূরণ হয়। তাহলে জেনে নেওয়া যাক এই অলৌকিক 'রাম মন্ত্র' সম্পর্কে, যা প্রথমে দেখি এক শ্লোকী রামায়ণে-

এক শ্লোকী রামায়ণ

আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম, হত্যা মৃগম কাঞ্চনম।
বৈদেহীহরণম জটায়ুমরণম, সুগ্রীব সম্ভাষণম।
বালীনির্দলনম সমুদ্রতরণম, লঙ্কাপুরীদাহনম।
পশ্চাদ রাবণ কুম্ভকর্ণ হননম, এতোদ্ধি রামায়ণম।

একটি শ্লোকে গোটা রামায়ণের সারমর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবারে শুনি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে পরমাত্মা রাম সম্পর্কে পার্বতী জানতে চাইলে তিনি কী বলছেন। স্বয়ং শিব বলছেন পার্বতীকে যে শ্রীরাম প্রকৃতি হতেও শ্রেষ্ঠ, অনাবিল, অদ্বিতীয়, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাস্বরূপ-তিনি পুরুষোত্তম, হিরণ্যগর্ভাদি জাত পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যিনি নিজ মায়াদ্বারা এই অখিল বিশ্ব সৃষ্টি করোতঃ আবার সেই সৃষ্টির অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত আছেন। পরমানন্দময় বিজ্ঞানস্বরূপ শ্রীরামের অজ্ঞান নেই। মায়া তাঁর অধীনস্থ বলেই তাঁকে কখনো বিমোহিত করতে পারেনা। যেমন-আকাশে তিনপ্রকার সুস্পষ্ট ভেদ দেখা যায়, ১) অনবচ্ছিন্ন মহাকাশ, ২)জলাশয়ে তলোবচ্ছিন্ন মহাকাশ এবং ৩)অন্যটি জল বা দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বাকাশ, এই তিনপ্রকার আকাশ-সেইপ্রকার ১)পূর্ণচৈতন্য, ২)অবছিন্নচৈতন্য এবং ৩) প্রতিবিম্বিতচৈতন্য যা আভাসচৈতন্য বলে পরিচিত।সেই পূর্ণচৈতন্যই ব্রহ্মস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন এক সত্ত্বা, তাতে যে বিচ্ছেদ দৃষ্ট হয় তা কল্পনাপ্রসূত বিকল্প জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। অবছিন্ন সাক্ষীচৈতন্যের প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই শুদ্ধচৈতন্য সাক্ষীরূপে অবস্থিত আছে যিনি "রাম" বা "আত্মারাম" পদবাচ্য, পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্বারা একত্র প্রতিপাদিত হয়। আভাসের শক্তি "র" এবং শব্দ হল ওঁ বা অউম, দুইয়ে মিলে "রাম"-পূর্ণব্রহ্মের রূপ এবং উপাধি দুইই অর্থাৎ নাম এবং রূপ তত্ত্বত অভেদ, নাম-নামী অভেদ তত্ত্ব। তাইতো কবি বলেছেন: "মন জপ নাম, শ্রীরঘুপতি রাম, নবদুর্বাদল শ্যাম, নয়নাভিরাম.... চরাচর যে নাম জপে অবিরাম।" এটি আমার গুরু শ্রীশ্রী মা সর্বাণীকৃত ব্যাখ্যা।

আবার রামরূপ বর্ণনা করেছেন কবি নজরুল এভাবে:

সজল জলদ নীল নবঘন কান্তি,
নয়নে করুণা, আননে প্রশান্তি।
নামস্মরণে টুটে যায় শোক তাপ ভ্রান্তি
রূপ নেহারি মুরছিত কোটি কাম।

ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপনের পথকে আত্মস্থ করার জন্য রাম যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তার চেয়ে ভাল উদাহরণ আর নেই। যিনি ধর্মকে যত্ন সহকারে এবং যে কোনও মূল্যে সমর্থন করেন, তা অযোধ্যা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে হোক বা বনে নির্বাসনে থাকা একজন সন্ন্যাসী হিসাবে, বলছেন আমাদের শাস্ত্রকারগণ। রাম দণ্ডকারণ্যে জীবনকে দ্বিগুণ আশীর্বাদ বলে মনে করেন কারণ এটি কেবল তার পিতার ইচ্ছা অনুসারে নয়, তাঁকে ধার্মিক

ঋষিদের সেবা করার সুযোগও দেয়। ঋষিরাও তাঁর পরাতত্ত্বকে চিনতে পেরেছেন এবং তাঁকে সান্নিধ্যে ও সুমুখে দেখার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান বলে গণ্য করেছেন। তাই রামের অবতারের রহস্য জেনে ঋষি সরভঙ্গ, মহান খ্যাতিসম্পন্ন ঋষি, রামকে তাঁর অতিথি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর আশ্রমে অপেক্ষা করেন।

রাক্ষস বিরাধ রামকে ঋষি সরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কে এই বিরাধ?
রামচন্দ্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে তখন দন্ডকারণ্যের বনে। এই বিশাল বনভূমি ছিল বর্তমানের মধ্যপ্রদেশ, উড়িশ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের এলাকা জুড়ে। বনবাসে আসার সময় রাম চাননি বিপদসংকুল পথে নারীর উপস্থিতি। তাই বারবার মানা করেছিলেন। কিন্তু সীতা শোনেননি। বনবাসের এক পর্যায়ে রামচন্দ্র ভ্রাতা ও স্ত্রীসহ এলেন দন্ডকারণ্যের বনে। সেই বনে বাস করত রাক্ষস যব ও রাক্ষসী শতহ্রদার পুত্র রাক্ষস বিরাধ। তার অস্ত্র ছিল একটি ত্রিশূল। সেই ত্রিশূলে তিনটি সিংহ,চারটে বাঘ, দুটো নেকড়ে, দশটা হরিণ ও একটি হাতির মাথা গাঁথা। শরীর ছিল তার পর্বতের মত সুবিশাল, দেহ দুর্গন্ধযুক্ত। বনের পথে হেঁটে চলেছেন তিনজন। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো রাক্ষস বিরাধ। সুন্দরী সীতাকে দেখে কোলে তুলে নিল সে। রাম-লক্ষ্মণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেলো ঘটনাটা। বাল্মীকি লিখেছেন, এই প্রথম সীতা পরপুরুষের স্পর্শ পেলেন। তাও ঘটলো আর্য পুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে।

রাম অবশ্য রাক্ষসের পথের গতি রোধ করে বললেন, কি তব পরিচয়। সে জানালো তার পরিচয়। এবং এও জানালো কেউ তাকে অস্ত্র দিয়ে মারতে পারবে না। কেননা সে স্বয়ং ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত। বাল্মীকি লিখছেন, রাক্ষস বিরাধ আসলে শাপগ্রস্থ গন্ধর্ব। সে যুগে দেব সভায় এরা নৃত্যগীত করতেন। বিখ্যাত গন্ধর্ব ছিলেন হাহা, হুহু, হংস, বিশ্ববায়ু,তম্বুরু প্রমুখ। রাক্ষস বিরাধ ছিল এই তম্বুরু। দেবসভায় তিনি এক নৃত্যগীত এর অনুষ্ঠানে গপ্পে মশগুল ছিলেন অপ্সরা রম্ভার সঙ্গে। দেবরাজ ইন্দ্র তো রেগে অগ্নিশর্মা। দিলেন অভিশাপ। যাও মর্ত্যলোকে। রাক্ষস জন্ম নিয়ে। কোনদিন রামচন্দ্র যদি এসে তাকে বধ করেন, তবেই মিলবে মুক্তি। শাপমুক্ত হবেন গন্ধর্ব।

তাই রাক্ষস এসেছে সীতা হরণে। রাম কিন্তু জানতেন না যে বাণবিদ্ধ করে রাক্ষসকে বধ করা যাবে না। বেশ কিছু শক্তিশালী বাণ ছোঁড়েন রামচন্দ্র। স্বাভাবিক ভাবেই রাক্ষসের মৃত্যু হলো না। আহত রাক্ষস সীতাকে কোল থেকে নামিয়ে রাম লক্ষ্মণকে দুহাতের মুঠোয় নিয়ে গভীর জঙ্গলে হাঁটা দিল। সীতা বিপদ বুঝে জোড়হাতে রাক্ষসের কাছে স্বামী রাম ও দেবর লক্ষ্মণের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। এই ব্যাপারটা রামের পছন্দ হলো না। তিনি ও লক্ষ্মণ প্রাণপণ শক্তি দিয়ে দেহের সর্বশক্তি দিয়ে রাক্ষসের হাত ভেঙে দিলেন এবং ঐষিকবাণ নিঃক্ষেপ করলেন তার ওপরে, সে আহত হল। তারপর মাটির গর্তে জীবন্ত সমাধি দিলেন রাক্ষস বিরাধকে। রাক্ষস রামকে প্রণাম জানিয়ে চোখ বুজলো। এই ছিল সীতাহরণের প্রথম প্রয়াস ।

এরপর রাবণ। তিনিও নাকি রাক্ষস। রাক্ষস মানে কি? অনেকগুলি অর্থ। নরখাদক কুৎসিতদর্শন নিশাচর প্রাণী। অবশ্যই আর্য যজ্ঞনাশকারী অনার্য জাতি বিশেষ। মূলত এটাই ঠিক। ভারতের বনবাসী কালো চামড়ার স্বল্পবাসধারী ভূমিপুত্র। এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসা আর্য সম্প্রদায়ের মুনি ঋষিরা বনে গড়ে তোলে আশ্রম। সেখানে মণ মণ কাঠ পুড়িয়ে ঘি পুড়িয়ে পরিবেশ দূষণ করে যজ্ঞের নামে গলা ফাটিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে বনের

নিস্তব্ধ পরিবেশ নষ্ট করত। যা পছন্দ ছিল না বনবাসীদের। তাই তারা দলবদ্ধ ভাবে আশ্রমে আক্রমণ করে যজ্ঞ পন্ড করে দিত। ব্যাকরণে রাক্ষস শব্দের অর্থ কি? রাক্ষস রক্ষ ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দ। অর্থাত্ রাক্ষস শব্দের অর্থ রক্ষাকর্তা। কিন্তু আর্য আগ্রাসনে সেই শব্দের বিকৃত মানে দাঁড়ায় নিকৃষ্ট কিছু। ঠিক যেমন অসুর শব্দ। যার অর্থ বীর।মহাশক্তিশালী। আমরা তাই বলি আসুরিক শক্তি। কিন্তু বৈদিক বিকৃতি হিন্দু ধর্মে এসে মানে হলো অশুভ শক্তি। আর্যরাও কিন্তু বহিরাগত নয়, এদেশেরই নাগরিক তারা, নগরবাসী, কিন্তু নির্জনবাসের নিমিত্ত বনে গমন তাদের। একথাও ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। এই যে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সীতা - অযোধ্যা নগরের বাসিন্দাই তো তাঁরা। ফিরে যাই রাক্ষস প্রসঙ্গে। অনেকেই বলেন রাবণ ব্রাহ্মণ। তাহলে তিনি রাক্ষস হন কীকরে? এই রহস্য খুঁজতে পুরাণ ঘাঁটতে হবে।

পুরাণ বলছে, লঙ্কানিবাসী তথাকথিত কালো চামড়া অনার্যদের সঙ্গে আর্য প্রতীক বিষ্ণুর প্রবল যুদ্ধ হয়। নগরজীবনে অভ্যস্ত অনার্যরা যুদ্ধ প্রায় ভুলে গিয়েছিল। সভ্য হয়ে ওঠার গুণাগার দিতে পরাজিত হয়ে অনার্যদের পাতালে চলে যেতে হয়। পাতাল? সেতো পৃথিবীর নিম্নভূমি। তারপর থেকে অনার্যদের বাসস্থান হয় ভারতের নিম্নভূমি। সেই পাতালের শুরু বিহার থেকে শুরু করে ঝাড়খণ্ড হয়ে বাংলার গঙ্গাসাগর। তাই হিন্দু শাস্ত্রে এই অঞ্চলকে বলা হয়েছে মেলেচ্ছ ভূমি বা ম্লেচ্ছ ভূমি আর এই অনার্যরাই আদতে জনজাতি গোষ্ঠী বা ভূমিপুত্র।

এই পরাজিত রাক্ষসদের অন্যতম ছিলেন সুমালী। তাঁর সুন্দরী কন্যা কৈকষী। সুমালী চাইলেন, তাঁর কন্যার স্বামী হোক ঋষি বিশ্রবা। এই ঋষি ছিলেন রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা হর্বিভুর গর্ভজাত। অর্থাত্ ক্ষত্রিয় মাতা। সে অর্থে ঋষি ব্রাহ্মণ নন। বিয়ে সম্পন্ন হয়। বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গরমে স্ত্রী পুত্র কামনা করায় ঋষি স্ত্রী কৈকষীকে বলেন, তোমার এই পুত্র হবে ক্রুর। হিংস্র। সেই পুত্র নাকি রাবণ। ভাববার কথা বটে পাঠক,বৈশাখের গরমে জন্মান তাই রাবণ ক্রুর। কিন্তু এযুগে রবীন্দ্রনাথও জন্মেছেন বৈশাখ মাসে, সত্যজিৎ রায়, মান্না দে এঁরা সবাই বৈশাখ মাসের জাতক অথচ স্বনামধন্য, বিশ্ববন্দিত। পুরাণ তাই অনেক কিছুই রূপকের আশ্রয়ে বলে থাকে বৈকি। যাক সেসব কথা। আসলে সেই তিনজন্ম ধরে বিষ্ণুকে শত্রুরূপে চেয়েছিলেন সেই বিষ্ণুর দ্বারপাল দুইভাই জয় আর বিজয়, পরে তারাই ত্রেতাতে রাবণ আর কুম্ভকর্ণ। আসলে অবতার পুরুষের অবতরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিলো এভাবেই।

ফিরে আসি কৈকষীর প্রসঙ্গে। কৈকষী আর ভুল করেননি। পরের পুত্র আর প্রখর গ্রীষ্মে কামনা করেননি। ফলে সেই পুত্র হলেন ধর্মশীল। বিভীষণ। রাম জীবনের শুরুতে কুলগুরু বিশ্বামিত্রের আদেশে দ্বিধায় থেকেও নারী হত্যা করেন। তাড়কা রাক্ষসী তার নাম। কি তার অপরাধ? ঋষি মুনিদের যজ্ঞ পন্ড করা। কেন করত সে? সে কথা তো আগেই বলেছি। আসলে রামচন্দ্র অবতরণ করেই ছিলেন জীব-উদ্ধার কল্পে, তাই সেই, তাড়কা, অহল্যা, খর, দূষণ, বিরাধ থেকে শুরু করে মুনি-ঋষি, রাক্ষস, চণ্ডাল, যক্ষ রক্ষ বানর সবাইকে উদ্ধার করে পৃথিবীতে পুনরায় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাই তো তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র । ফিরে আসা যাক বিরাধ প্রসঙ্গে। বিরাধ আসলে ইন্দ্রের অভিশাপের অধীন এবং রাম তাকে তা থেকে মুক্তি দেন ।

সরভঙ্গ ঋষি

****

রাক্ষস বিরাধের পরামর্শে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতা সরভঙ্গ ঋষির আশ্রমের চত্বরে পৌঁছানোর সাথে সাথে তারা একটি বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হন-একটি ঐশ্বরিক রথে স্বর্গীয় দর্শনার্থীরা চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। রাম বিনয়ের সাথে ঋষির কাছে আসেন। ঋষি অভিভূত হন এবং রামকে জানান যে যেহেতু তাঁর দেহ ত্যাগ করার সময় হয়েছে, তাই ইন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিতে এসেছেন-এই একটি অধিকার যা তাঁর কঠোর তপস্যার দ্বারা অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ঋষি তাঁর অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পেতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষায় ছিলেন হাজার হাজার বছর ধরে। এখন তিনি রামকে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন, সরভঙ্গ ঋষি আগুন জ্বালিয়ে তাতে প্রবেশ করলেন রাম অবতারের দর্শনের পরে। স্থূল দেহ নিক্ষিপ্ত হল অগ্নিকুন্ডে এবং তাঁর একটি যুবক অতীন্দ্রিয় সত্ত্বারূপ স্বর্গের দিকে আরোহন করল। রাম আবার আশেপাশের অন্যান্য ঋষিদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাদের সেবা করবেন এবং রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। রাম তাদের ভয় দূর করতে বলেন।

সরভঙ্গ ঋষির কথা রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড (অরণ্য কাণ্ড) উল্লিখিত আছে। দন্ডকারণ্য বনের মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় রাম তাঁকে দেখতে পান। রামের দর্শনের আগে, ভগবান ইন্দ্র ঋষিকে স্বর্গীয় ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আশ্রমে উপস্থিত হন। সরভঙ্গ ঋষির শেষ ইচ্ছা ছিল নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে রামকে দেখা। রামকে দেখার পর এবং প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করার পর, পবিত্র মানুষ তার বৃদ্ধ দেহটিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অগ্নিতে নিক্ষেপ করে ব্রহ্মলীন হন এবং তাঁর সূক্ষ্ম শরীর স্বর্গের দিকে উঠে যায়। এই আচার শুরু করার আগে, তিনি রামকে তা দর্শন করতে অনুরোধ জানান।

সরভঙ্গ ঋষির এই ঘটনা তাঁর শ্রীরামচন্দ্রর প্রতি অবিচল শরণাগতি সূচিত করে এবং রামরূপের মহিমা আরো উজ্জ্বল করে তোলে।

হনুমানের কথা

****

একটা গল্প আছে৷ একবার হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, “আচ্ছা হনুমান, তুমি তো বড় ভক্ত৷ তুমি জান যে নারায়ণ ও রামের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই, তবু তুমি সর্বদাই রামের নাম নাও, কদাপি ভুলেও নারায়ণের নাম নাও না। যদিও রাম ও নারায়ণ মূলগত ভাবে একই সত্তা, তবু তুমি এমনটি কর কেন?” হনুমান জ্ঞানগুণ সাগর, তিনি উত্তর দিলেন-“হ্যাঁ, নারায়ণ ও রাম তত্ত্বতঃ একই সত্তা৷ কেবল নামেই তফাৎ৷ ‘নারায়ণ’ একটি সংস্কৃত শব্দ৷ নার অয়ন করে সন্ধিবন্ধ শব্দ হ’ল ‘নারায়ণ।‘ সংস্কৃত ‘নার’ শব্দের তিনটি মানে। একটি মানে হ’ল জল দ্বিতীয় মানে হ’ল পরমা প্রকৃতি, আর তৃতীয় মানে হ’ল ভক্তি। নার+ড=নারদ মানে যিনি জীবকুলে নার অর্থাৎ ভক্তি বিতরণ করেন। এখানে ‘নারদ’ শব্দের ‘নার’ মানে ভক্তি। ‘নার’ শব্দের আরও দুটো মানে বলেছি জল ও পরমা প্রকৃতি। ‘অয়ন’ মানে আশ্রয়৷ শিবায়ন মানে শিবের আশ্রয়৷ রামায়ণ মানে রামের যেটা

আশ্রয় অর্থাৎ এমন একখানা গ্রন্থ যাতে রামকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। 'অয়ন' মানে আশ্রয়। নারায়ণ মানে নার অর্থাৎ পরমা প্রকৃতির আশ্রয়। এখানে পরমা প্রকৃতির আশ্রয় কে?-না, পরমপুরুষ। তাই নারায়ণ মানে পরমপুরুষ"-(Cosmic Consciousness, Supreme Cognition)।

এখন 'রাম' শব্দের অর্থ কী? একটি মানে হ'ল 'রমন্তে যোগিনঃ যস্মিন্* অর্থাৎ 'রাম' হলেন এমনই এক সত্তা যাকে যোগীরা তাঁদের মানসাধ্যাত্মিক আভোগ (Psycho-spiritual Pabulum) হিসেবে গ্রহণ করেন, মানসাধ্যাত্মিক আনন্দের উৎস বলে মনে করেন। এখন এই যে যোগীদের মানসাধ্যাত্মিক আনন্দের উৎস, ইনি কে?-না, পরমপুরুষ। তাই 'রাম' মানে পরমপুরুষ বা নারায়ণ। রাম শব্দের অপর মানে হ'ল-'রতি মহীধরঃ রামঃ*। 'রাতি' শব্দের আদ্যক্ষর 'রা' আর 'মহীধরঃ' শব্দে প্রথম বর্ণ হ'ল 'ম'। বিশ্বের সবচেয়ে জ্যোতিষ্মান সত্তা হ'ল রাম যিনি অপরকেও তারই মত জ্যোতিষ্মান করে তোলেন। তাঁর জ্যোতিতে অন্যান্য সত্তারাও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। চাঁদ তার দীপ্তি পেয়ে থাকে পৃথিবী থেকে। পৃথিবী জ্যোতি পেয়ে থাকে সূর্য থেকে আর সূর্য আলো পেয়ে থাকে পরমপুরুষের কাছ থেকে। তাই পরমপুরুষ হলেন এমন এক সত্তা যিনি অপরকে তাঁর মত প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। কে সেই প্রোজ্জ্বল সত্তা?

'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥'

BANGI

শ্লোকটি "শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" র অংশ যেখানে পরমপুরুষই হলেন সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময় সত্তা। 'রাতি মহীধরঃ' মানে সেই পরমপুরুষ-অন্য কেউ না। 'রাম' শব্দের তৃতীয় মানে হ'ল 'রাবণস্য মরণম্ রামঃ'। 'রাবণস্য' শব্দের আদ্যক্ষর হ'ল 'রা' আর 'মরণম্' শব্দের আদ্যক্ষর হ'ল 'ম'। তাই 'রাম' মানে সেই সত্তা যার চাপে রাবণের মৃত্যু হয়। 'রাবণ' শব্দের মানে হ'ল দুষ্ট মন, অধোগামী মন যা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ, অধঃ, ঈশান, নৈঋত, অগ্নি ও বায়ু এই দশ দিকেই কাজ করে চলেছে। মানুষের যা কিছু দুষ্প্রবৃত্তি যা এই দশ দিকে ছুটে চলে তারই সামূহিক নাম রাবণ। রৌ+অণ=রাবণ অর্থাৎ যার প্রবণতা হ'ল নরকের পথে চলা। এই রাবণের মৃত্যুর বীজ কোথায় নিহিত? এই দশানন দৈত্যের কোথায় মৃত্যু? মানুষ যখন রামের শরণ নেয় তখনই রাবণের মৃত্যু। তাই 'রাবণস্য মরণম্' মানে রাম। যে মানুষ রামের অর্থাৎ পরমপুরুষের শরণ নেয় সে অবশ্যই রাবণকে নিধন করতে পারে। তাই 'রাবণস্য মরণম্' মানে পরমপুরুষ। তাই রাম ও নারায়ণে কোন মৌল পার্থক্য নেই। তবুও/হে হনুমান, তুমি সর্বদাই কেবল রামেরই নাম নাও, কদাপি নারায়ণের নাম নাও না। এ কেমনতর ব্যাপার*। উত্তরে হনুমান বলছেন:-

'শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

যখন সর্বাধিক আন্তরিকতা নিয়ে কোন বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাও তখন মনের যাবতীয় বৃত্তিকে একটা বিশেষ বিন্দুতে সংহত করতে হয়। আর সেই সংহত বা একীভূত বিন্দুস্থ অহংবোধকে অদ্বিতীয় সত্তার দিকে চালিয়ে

দিতে হয়। তাই হনুমান বলছেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে*।" 'শ্রী' শব্দের যোগরূরার্থ হ'ল লক্ষ্মী ধনের দেবতা এর ভাবরূরার্থ হ'ল রজোগুণী শক্তি যা প্রভূত শক্তিসম্পন্ন।

সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেকটি শব্দের দু ধরনের মানে-একটি ভাবরূরার্থ, অপরটি যোগরূরার্থ। ভাবরূরার্থ মানে ব্যুৎপত্তিগত মানে, যোগরূরার্থ মানে ব্যবহার সিদ্ধ মানে। ধরা যাক, একটা শব্দ 'পঞ্চানন।' 'পঞ্চানন' মানে পাঁচটি মুখযুক্ত সত্তা। এটি হ'ল ভাবরূরার্থ, কিন্তু মানুষ 'পঞ্চানন' শব্দ ব্যবহার করে শিবের জন্যে। এটা হ'ল যোগরূরার্থ। আবার ধরা যাক , 'নিল', 'অনিল'। 'নিল' মানে স্থির, 'নীল' মানে নীল রঙ 'অনিল' মানে যা স্থির নয়, যা ছুটে চলেছে, বয়ে চলেছে। এটা ভাবরূরার্থ। যোগরূরার্থ হবে বায়ু। বায়ু এক মুহূর্ত্ত অচঞ্চল বা স্থির হয়ে থাকে না। তাই এর নাম 'অনিল'। এটা হ'ল যোগরূরার্থ, ভাবরূরার্থ হ'ল যা স্থির নয়।

তিনটে বর্ণ আছে শ, র, ঈ। 'শ' ধ্বনিটি হ'ল রজোগুণের বীজমন্ত্র, 'র' ধ্বনি 'এনার্জি' বা শক্তির বীজমন্ত্র, আর 'ঈ' হ'ল স্ত্রীলিঙ্গবাচক-/স্ত্রিয়াম্ ঙীষ্*। তাই যার মধ্যে রজোগুণ আছে, যার মধ্যে শক্তি বা কর্মচঞ্চলতার অভিব্যক্তি আছে, যা স্ত্রীবাচক তাই 'শ্রী'। বিশ্বের সবাই রজোগুণী কর্মদ্যোতনায় সমৃদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে চায়। তাই প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে নামের আগে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। 'শ্রীনাথ' মানে শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পতি অর্থাৎ নারায়ণ, জানকীনাথ মানে জানকী অর্থাৎ সীতার পতি রামচন্দ্র। 'সীতা' শব্দ আসছে 'সী' ধাতু থেকে। 'সী' মানে চর্চা করা, ত্রা*র বা হলাকর্ষণ দ্বারা জমিকে উর্বর করে তোলা। 'সী' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন 'সীতা' মানে উত্তমরূপে চর্চিত ভূমি অর্থাৎ যতদূর সম্ভব উর্বর করে তোলা। এখন এই যে চর্চার দ্বারা উৎকর্ষসাধন এটা আসছে কোত্থেকে? কার কাছ থেকে এই চর্চার সমর্থন বা প্রেরণা আসছে?-না, পরমপুরুষের কাছ থেকে। যাই হোক, এই শ্রীনাথ বা জানকীনাথ মানে হ'ল পরমপুরুষ। তাহলে শ্রীনাথ ও জানকীনাথের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হনুমান সেটা জানেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রকার মৌলিক পার্থক্য নেই।

তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ*। তাই মনের সমস্ত বৃত্তিকে সেই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার দিকে চালিয়ে দিতে হবে, কেবল নিজের ইষ্টমন্ত্রের দিকে মন রেখে। অন্য কোন দ্বিতীয় মন্ত্রের দিকে নয়। তাই হনুমান বলছেন, 'এই জন্যে আমি সব সময় কেবল রামের নামই নিই-নারায়ণের নয়। এমনকি নারায়ণকে আমি জানিও না।' তাই তুলসীদাসজী বন্দনা গেয়েছেন রামচরণের:

রামচরণ অবিরাম কামপ্রদ তীরথ রাজ বিরাজে,
শঙ্কর সুবন ভক্তি রতন ধন প্রেম অকছয় বট ভাজে।
সর্বার্থসিদ্ধি শ্রীরাম ধ্যান মন্ত্র-
ওঁ পদামপ হর্তারম দাতারম সর্ব সম্পদম
লোকাভিরাম শ্রীরাম ভূয়ো ভূয়ো নামাম্যহম।
শ্রীরাম রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে,
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ।

আবার ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানজীর আরেকটা গল্প দিয়ে শেষ করি। অন্যায় ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ন্যায়ের, ত্রেতা যুগ চলছে। এবার প্রভু রামচন্দ্রকে ফিরে যেতে হবে দেবলোকে। কালের দেবতা যম কিন্তু প্রভুভক্ত হনুমানের ভয়ে সাহস করে অযোধ্যায় ঢুকতে পারছেন না কিছুতেই। রামচন্দ্র জানতে পারলেন এহেন গুহ্য কথা। ছলনা করে নিজের প্রিয় আংটিটি লুকিয়ে ফেললেন কোথায়? পাতালে-আংটি গড়াতে গড়াতে সোজা এক্কেবারে পাতালপুরী। আংটি খোঁজার অছিলায় তিনি হনুমানকে পাঠিয়ে দিলেন নাগরাজ্যে। সেখানে গিয়ে হনুমান দেখেন আংটির পাহাড়। সবই প্রভুর আংটি। কোনটি যে খুঁজতে এসেছেন সঠিক চিনে উঠতে পারছেন না কোনো মতেই। এদিকে হনুমানের অনুপস্থিতিতে দুর্বাশা মুনির রূপ ধরে কালান্তক যমদেব এলেন রামের সাথে দেখা করতে। পাহারায় থাকা লক্ষ্মণের কাছে বাধা পেয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে অভিশাপ দিলেন তাকে। সরযূ নদীর জলে নিজেকে বিসর্জন দিলেন লক্ষ্মণ। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে আকূল শ্রীরামচন্দ্র আত্মবিসর্জন দিলেন যমুনার বুকে। ওদিকে পরমভক্ত হনুমানকে তখন নাগরাজ বাসুকি শেষনাগ জন্ম মৃত্যুর ইতিবৃত্ত বোঝাচ্ছেন। সংখ্যাতীত আংটি মাঝে যেমন হনুমান দেব প্রভুর নির্দিষ্ট আংটিটি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, কারণ রাম সর্বকালে সর্বযুগে কোটি কোটি ঘটে ঘটে বাস করেন, সেই গীতার "সম্ভবামী যুগে যুগে" তত্ত্ব। তাই সেইসব কালের আর যুগের আংটির পাহাড় তাঁর হয়ে রয়েছে পাতালে, আমরাও খুঁজতে চেষ্টা করি আমাদের অন্তরের আলোকজ্যোতি আত্মারামকে.....সাধনে, মননে, ধ্যানে কিন্তু তিনি যে 'ধ্যানগম্য অগোচরম', শুধুই বশ তিনি শুদ্ধাভক্তির, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির, তাই বন্দনা করি তাঁকে এভাবে:

BANGL

ওঁ লোকাভিরামম রণরঙ্গধিরাং
রাজীবনেত্রম রঘুবংশনাথম।
কারুণ্যরূপম করুণাকরম তং
শ্রীরামচন্দ্রম শরণম প্রপোদ্যে।

শ্রী রাম গায়ত্রী মন্ত্র:

ওঁ দাশরথয়ে বিদ্মহে জানকীবল্লভায় ধীমহি
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম

পরিশেষে কবীরজীর কথা দিয়ে সমাপ্তি হোক রাম পরাতত্ত্বের:

রাম বিনা কছু নাহি সাধো রাম বিনা কছু নাহি
রাম হি আগে রাম হি পিছে রাম হি বোলে মাহি।
উত্তর রাম দক্ষিণ রাম পুরব রাম পশ্চিম রাম
স্বর্গে পাতাল মহিতল রামা, রাম সকল বিশ্রামা।

॥অশোকষষ্ঠী ও অশোকাষ্টমী॥

অশোকষষ্ঠী আজকে, নয়ই এপ্রিল তারিখে অশোক অষ্টমী, তাই নিয়ে একটু আলোচনা।
অল্পসংখ্যক উদ্ভিদ আছে যারা তাদের কাণ্ড ফুড়ে থেকে ডালপালা জুড়ে ফুল ফোটায়। তাছাড়া অশোকের প্রস্ফুটন কাল অতি দীর্ঘ বলে এই সময় গাছগুলি ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়।

"রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোক পলাশে
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।"

রবীন্দ্রনাথের অনেক অনেক কবিতা ও গানে ঘুরে ফিরে এসেছে এই অশোকের কথা। তাছাড়া অশোকের সাথে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সুগভীর সম্পর্ক আছে,তারও কিছু ছোঁয়া থাকবে। আগেকার দিনে বলত বাড়িতে অশোক গাছ লাগালে সংসারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে। কারণ অশোক গাছ লাগালে শরীর সুস্থ থাকত, শরীর সুস্থ থাকবে মন থাকবে তরতাজা।

বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত মিলিয়ে অশোক ফুলের অনেকগুলি নাম আছে, যেমন-অপশোক, বিশোক, কঙ্গেলি, কর্ণপূরক, কেলিক, চিত্র, বিচিত্র, দোষহারী, নট, পল্লবদ্রুপ, প্রপল্লব, পিণ্ডিপুষ্প, বঞ্জুলদ্রুম, মধুপুষ্প, রক্তপল্লবক, রাগীতরু, শোকনাশ, সুভগ, স্মরাধিবাস, হেমপুষ্প, হেমাপুষ্প, হিমাপুষ্পা, অঞ্জনপ্রিয়া, মধুপুষ্প, পিণ্ডিপুষ্প, সীতা-অশোক ইত্যাদি।

অশোকের ইংরেজি নাম হচ্ছে-Ashoka, Sorrowless, Yellow Ashok, Yellow Saraca ইত্যাদি।
আর এর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে-Saraca ইন্ডিকেটে

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী মতে গৌরী দেবী এই বৃক্ষের নিচে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করে শোক থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সেই কারণে এই বৃক্ষের নাম অশোক হয়েছে। শুধু কি তাই! রোগ নিরাময়ে, ভেষজ গুণে,শীতল ছায়ায়,পুষ্প প্রাচুর্যের মত কারণেই অশোকের নামকরণ সার্থক।

রামায়ণে বলে সীতাকে অপহরণ করে অশোকবনে রাখা হয়ে ছিল। কামদেবের পঞ্চশরের অন্যতম শর এই অশোক ফুল দিয়ে সজ্জিত, তাই অশোক ফুল প্রেমের প্রতীক। হয়তো এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ অশোককে এতো বার হাজির করেছেন নিজের সৃষ্টিতে।

কথিত আছে গৌতম বুদ্ধ লুম্বিনিতে অশোক গাছের নিচে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এবং মহাবীর এই অশোক গাছের নিচে ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই হিন্দু ও বৌদ্ধদের কাছে এই অশোক গাছ ও ফুল অত্যন্ত পবিত্র। অজস্র ফুলে ঘনবদ্ধ অশোকমঞ্জরি বর্ণ ও গড়নে আকর্ষণীয়। তাজা অশোক ফুলের রং কমলা, কিন্তু বাসি হলেই ফুলের রং হয় লাল। অশোকের পরাগকেশর দীর্ঘ।
রবীন্দ্রনাথ অশোক বন্দনার নমুনা এমন-

"আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র জ্যোৎস্নারাতে
অশোক শাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে।"

বাসন্তী পূজার শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে আর অষ্টমীতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে অশোকষষ্ঠী আর অষ্টমীতে অশোক অষ্টমী পালন করা হয়। জেনে নেওয়া যাক এই ব্রতের পেছনে প্রচলিত কাহিনী।

প্রাচীনকালে এক অশোক বনে এক মুনি বাস করত। একদিন সকালবেলায় তিনি দেখলেন অশোক গাছের নিচে এক ফুটফুটে মেয়ঙ হাত, পা ছুড়ে কাঁদছে। মুনি মেয়েটিকে তার কুটিরে নিয়ে এলেন। পরে ধ্যান করে জানতে পারলেন, একটি হরিণী মেয়েটিকে প্রসব করেছে। অশোক গাছের নিচে মেয়েটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন বলে তিনি মেয়েটির নাম রাখলেন অশোকা। মেয়েটি বড় হয়ে অপূর্ব সুন্দরী দেখতে হল। তখন মুনি ভাবলেন মেয়েটিকে বেশিদিন একা কুটিরে রাখা যাবে না, হাতের কাছে ভালো পাত্র পেলেই তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেলেও ভালো পাত্র না পেয়ে একদিন বিরক্ত মুনি শপথ করলেন পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যার মুখ আগে দেখবেন তার সাথেই তিনি মেয়েটির বিয়ে দেবেন।

সকালে উঠে মুনি দেখলেন এক রাজপুত্র তার কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুনি তার পরিচয় জানতে চাইলে রাজপুত্র বললেন, "আমি রাজপুত্র, মৃগয়া শিকারে এসেছিলাম। ঝড়-বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে আপনার কুটিরে আশ্রয় নিতে এসেছি।"

তার পরিচয় জেনে মুনি ভারী খুশি হলেন এবং বললেন, "আমার একটি বিবাহযোগ্য অপূর্ব সুন্দরী কন্যা আছে। তোমাকে তাকে বিয়ে করতে হবে।"

এই বলে মুনি তার মেয়েকে রাজপুত্রের সামনে নিয়ে আসলে রাজপুত্র তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করলেন। চার হাত এক করতে পেরে মুনি নিশ্চিন্ত হলেন। অশোকা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় মুনি তার আঁচলে অশোক ফুল আর অশোকের বীজ বেঁধে দিয়ে বললেন, "চৈত্র মাসের অশোক ষষ্ঠী আর অশোক অষ্টমীর দিন অশোক ফুলগুলো শুকিয়ে গেলে খাবে আর এখান থেকে যাবার সময় রাজবাড়ী পর্যন্ত পথের দুধারে অশোকের বীজগুলো ছড়াতে ছড়াতে যাবে। যদি কোনোদিন বিপদে পড়, তাহলে অশোক গাছের সারি বরাবর আমার আশ্রমে আমার কাছে আসতে পারবে। আর মনে করে অশোক ষষ্ঠী আর অশোক অষ্টমীর দিন কোনো অন্ন খাবে না।"

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী অশোক ষষ্ঠী পালন করলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয় না এবং সন্তান সুখে থাকে। যে কোনও ষষ্ঠীর মতোই অশোক ষষ্ঠীও সন্তানের মঙ্গলকামনায় করা হয়ে থাকে।

এই বলে মুনি তাদের বিদায় দিলেন। অশোকা, মুনির কথামতো অশোকের বীজ পথের দুধারে ছড়াতে ছড়াতে শ্বশুরবাড়ি গেল। শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছালে শ্বশুর, শাশুড়ি তাকে বরণ করে ঘরে তুললেন। কিছু সময় পর অশোকার

সাতটি ছেলে ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল। কিছুদিন পর তার শ্বশুর শাশুড়ি মারা গেল। তারপর ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাদের বিয়ে হল।

এইভাবে দিন এগোতে থাকল। একটি চৈত্র মাসের অশোকষষ্ঠীর দিন অশোকার শ্বশুরের শ্রাদ্ধ ছিল। সন্ধের পর তিনি তাঁর বউদের বললেন, "আজ অশোক ষষ্ঠী। আমি আজ ভাত খাব না।"

বউয়েরা তার জন্য মুগকলাই সিদ্ধ করে দিল। কিন্তু ঘুটে দিয়ে মুগকলাই সিদ্ধ করার সময় ঘুঁটের মধ্যে একটা ধান ছিল, যেটা মুগকলাই এর মধ্যে পড়ে গিয়ে ফুটে খই হয়ে গেল।

অশোকা না জেনেই সেটাও খেয়ে নিলেন। এর ফলে পরদিন তিনি দেখলেন তার সাত ছেলে বউ মারা গেছে। আবার অন্য গল্পমতে অশোকা নিজেই অশোক ষষ্ঠীর দিন ভুল করে ভাত খেয়ে ফেলেন এবং তার ফলেই তার ছেলে বউ মারা যায়। সব হারিয়ে অশোকার তার বাবার কথা অর্থাৎ মুনির কথা মনে পড়ে। তিনি মুনির আশ্রমে যাবার জন্য তৈরি হলেন। পথে যাবার সময় অশোক গাছের সারি দেখে মুনির আশ্রমে পৌঁছলেন। গাছগুলো ততদিনে বিশাল আকার ধারণ করেছে।

মুনির কাছে সব কথা খুলে বললে মুনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যান করে তিনি সব জানতে পারলেন। তিনি বললেন অশোক ষষ্ঠীর দিন ঘুঁটে দিয়ে মুগকলাই সিদ্ধ করার সময় ঘুঁটের মধ্যে একটা ধান ছিল সেটা মুগকলাই এর মধ্যে পড়ে গিয়ে ধান ফুটে খই হয়ে গিয়েছিল। সেই খাবার খেয়ে তার এই সর্বনাশ হয়েছে। কন্যার অনুরোধে মুনি তার ঘটি থেকে জল দিয়ে বললেন, "এই জল নিয়ে গিয়ে সবার উপর ছিটিয়ে দাও সবাই আবার বেঁচে উঠবে। আর চৈত্র মাসের ষষ্ঠীর দিন মা ষষ্ঠীর পুজো দিয়ে অশোকফুল মুগকলাই দই দিয়ে খাবে, ভুলেও অন্ন আহার করবে না। তাহলে এই জীবনে আর শোক পালন করতে হবে না।"

মুনির কথা শেষ হলে মুনিকে প্রনাম করে অশোকা কমন্ডলুর জল নিয়ে ছুটে ছুটে রাজবাড়ী এলেন। এসেই জল নিয়ে সবার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। সবাই আবার জেগে উঠল। সেদিন অশোক অষ্টমী ছিল। তারপর অশোকা তাদের সব কথা খুলে বললে সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। মুখে মুখে এই কথা প্রচার হয়ে রাজ্যময় ছড়িয়ে পড়ল। অশোক ষষ্ঠী আর অশোক অষ্টমীর মাহাত্ম্য শুনে সবাই এই ব্রত পালন করতে আরম্ভ করল।

অশোক গাছকে ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে দেখা হয় আর মানা হয় এই গাছ প্রেমের দেবতা কামদেবের আবাসস্থল হিসেবে।

একই দিনে অর্থাৎ অশোক ষষ্ঠীর দিনে গয়াতে স্কন্দষষ্ঠী পালিত হয় আর উত্তর ভারতে সূর্য ষষ্ঠী পালিত হয়। অশোক শব্দের অর্থ যা হৃদয় থেকে শোক নাশ করে।

অশোক গাছ পবিত্রতারও প্রতীক কারণ মাতা সীতাকে অশোক বনে বন্দিনী করে রেখেছিলেন বটে রাবণ কিন্তু তাঁর পবিত্রতা নষ্ট করতে পারেননি।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় অশোক গাছের উপকারিতা বিস্ময়কর। আমরা অনেকেই জানিনা এ গাছ কি কি উপকারে আসে আমাদের। অনেকে এ গাছ লাগিয়ে থাকে মূলত ফুলের সৌন্দর্যের কারনে কেননা অশোক গাছের ফুল দেখতে অসাধরন সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। অশোক গাছের ফুল মূলত হেমন্ত, শীত ও বসন্ত কালে ফুটতে দেখা যায়। তবে এর ফুল ফোটার প্রধান মৌসুম হল বসন্তকাল। অশোক গাছের অনেক উপকারীতা রয়েছে যা আমাদের ধারনার বাহিরে রয়েছে। সাধারনত অশোক গাছের ছাল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর স্বাদ তিতে ও ঝাঝলো হয়ে থাকে।

হিন্দু ধর্মে উপকারী এবং পবিত্র বলে বিবেচিত হয় এই অশোক গাছটিকে, হিন্দু ধর্মে এ গাছের পাতাগুলো মঙ্গলিক ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ঘরে অশোক গাছ লাগালে শুভ সময় বহে আনে এবং একজন ব্যক্তির সমস্ত শোষণ হতে মুক্তি মিলে।

অশোক গাছের গুনাগুন:-
*অ্যালার্জি সমস্যা দূর করে।

*অশোক গাছ এর ছাল ঋতুস্রাবের বাধা থেকে মুক্তি দেয়।

*অনিয়মিত পিরিয়ড বা বন্ধ্যাত্ব, অশোক গাছ এর ছাল মহিলাদের প্রতিটি সমস্যা সমাধান করে।

*প্রতিদিন অশোকের ছাল দিয়ে তৈরি পানিয় পান করলেও গর্ভধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

*হৃদরোগের ঝুকি কমায়।

*আমাময়জনিত বা ডায়রিয়া চলাকালিন রক্তপাত দেখাদিলে অশোক ফুলের নির্যাস অল্প পরিমান পানিতে মিশিয়ে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

*শ্বাসকষ্ট হলে অশোকের বীজ পানের সঙ্গে চিবিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট সমস্যা থেকে উপকার পাওয়া যায়। শরীর থেকে ক্ষতিকর টকসিন বের করে দিতে সহায়তা করে।

*পাইলস হলে এই অশোকের ছাল খেলে পাইলস থেকে রক্তপাত কমাতে সাহায্য করে।

*কৃমিনাশক সমস্যা সমাধান ও শরীরের কক্ত পরিস্কার করে থাকে।

*ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে সাহায্য করে।

স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা: মহিলাদের মধ্যে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা এবং ঋতুস্রাবজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য যুগ যুগ এই গাছের ব্যবহার চলে আসছে। ভেষজ এই উপাদানটি জরায়ুর পেশী এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের জন্য টনিক হিসেবে কাজ করে, যা ঘা এবং পেটের যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি অনিয়মিত ঋতুস্রাব, ডিসমেনোরিয়া, লিউকোরিয়া, ফাব্রয়েডস, সিস্ট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত অসুস্থতার লক্ষণগুলি নিরাময়ের জন্য এবং এড়াতে সাহায্য করে।
অশোকগাছ ও অশোকফুল ওষধিগুণে সমৃদ্ধ, তাই আয়ুর্বেদিক ওষুধ “অশোকরীষ্ট” যা মেয়েদের ঋতুকালীন সমস্যায় দেওয়া হয়, তা অশোকগাছ আর তার ফুল থেকে তৈরী হয়।

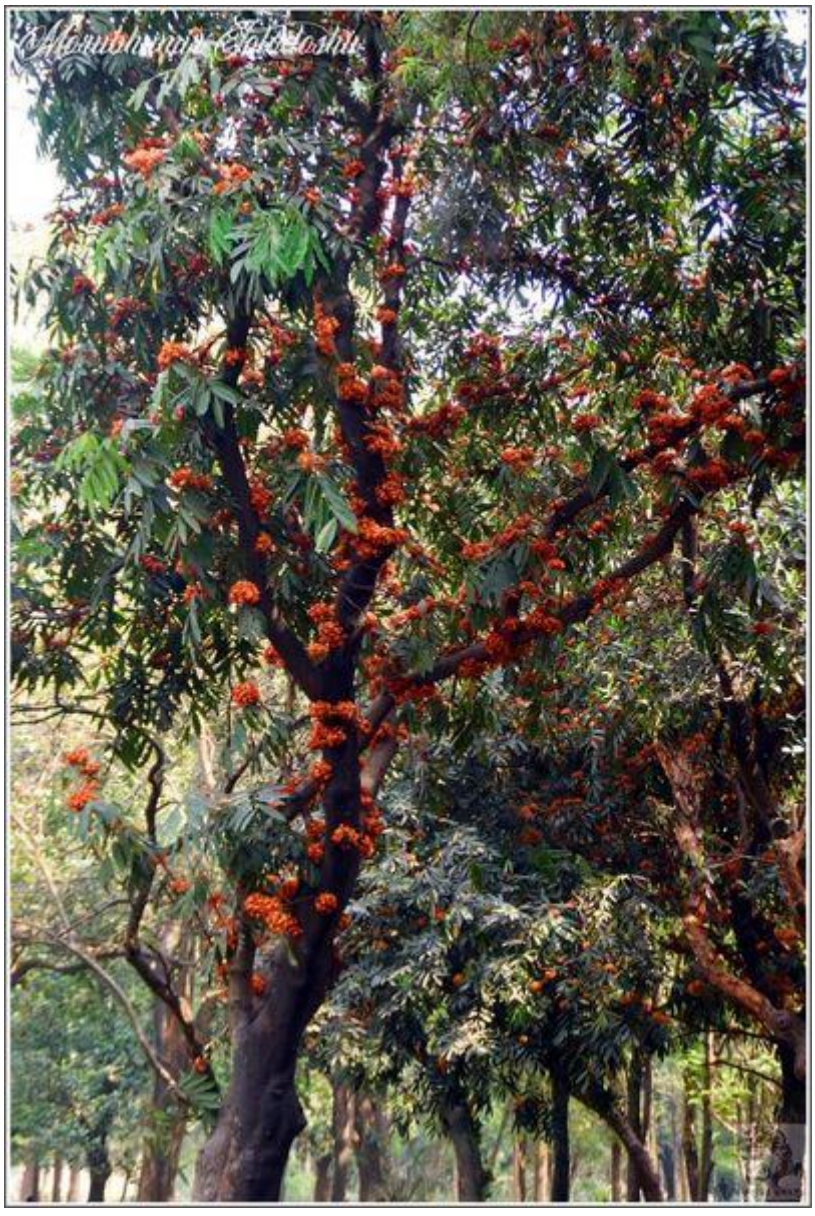

Moumbhumia Foladesha

॥নীলঘরের বাতি॥

ছোটবেলায় “নীলঘরের বাতি” বলতো রেবাদি, আমার মায়ের গৃহকর্মের সহায়িকা ছিল সে, আসলে সেটা নীলষষ্ঠী। আজকে সেই নীলঘরের বাতির দিন।

নীলপূজা বা নীলষষ্ঠী হল সনাতন বঙ্গীয় দের এক লোকোৎসব, যা মূলত নীল-নীলাবতী নামে (শিব-দুর্গা)এর বিবাহ উৎসব। বাঙ্গালী গৃহিণীরা নিজের সন্তান এর মঙ্গল কামনায় নীরোগ সুস্থ জীবন কামনা করে নীলষষ্ঠী ব্রত পালন করে সাধারণত চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক উৎসবের আগের দিন নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

“নীলের ঘরে দিয়ে বাতি,
জল খাও মা সন্তানবতী।”

এটা ছিল মহিলাদের একে অপরকে বলা স্বস্তিবচন নীলষষ্ঠীর দিন। ঐদিন সন্তানবতী হিন্দু নারীরা সারাদিন উপবাস রেখে সন্তানের আয়ু বৃদ্ধির কামনায় ‘নীল ষষ্ঠী’র ব্রত করে। নীলপূজার পর সন্ধ্যাবেলায় শিবমন্দিরে বাতি দিয়ে জলগ্রহণ করে।

বাঙালি গৃহিণীরা নিজের সন্তান এর মঙ্গল কামনায় নীরোগ সুস্থ জীবন কামনা করে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীলষষ্ঠী ব্রত পালন করে। জেনে নেওয়া যাক এই ব্রতের পেছনে প্রচলিত কাহিনী।

এক দেশে এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী বাস করতেন। তারা অতি ভক্তি করে সমস্ত বার-ব্রত পালন করতেন, তবুও তাদের সন্তান একটাও বাঁচে না। তাদের মনে এই ধারণা হল যে এই সব বার-ব্রত করে কিছু লাভ নেই। আসলে সমস্তটাই মিথ্যে। এই বলে তারা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দু'জনে কাশী চলে গেলেন।

একদিন কাশীতে গঙ্গায় দুজনে স্নান করে উঠে ঘাটের উপর বসে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। তাই দেখে মা ষষ্ঠী বুড়ি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরে এসে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ গা,তপরা কাদছিস কেন?”

ব্রাহ্মণী বললেন, “সে কথা তোমায় বলে কী হবে মা! আমরা বড় মনের জ্বালায় জ্বলছি, আমাদের অনেকগুলো ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু সব ক'টাই মরে গেল। তাই ভাবছি যে, সব বার-ব্রত, ঠাকুর দেবতা মিথ্যে। আমরা তো কোন বার-ব্রত বাদ দিইনি, তবে কেন আমাদের সব সন্তান মরে গেল?” মা ষষ্ঠী বললেন, “দেখো বাছা, তোমরা সব বার-ব্রত করো ব’লে মনে বড় অহঙ্কার ছিল, সেইজন্যে সব মরে গেছে। শুধু কি আর বার-ব্রত করলেই হয়? ভগবানের ওপর বিশ্বাস থাকা চাই, মন পবিত্র থাকা চাই, সবার কাছে নিচু হওয়া চাই, একমনে মা ষষ্ঠীকে ডাকা চাই, তবে হয়।”

তখন ব্রাহ্মণী বলল, “তাহলে আমাদের উপায় কী হবে মা?”
মা ষষ্ঠী জিজ্ঞাসা করলেন, “তোরা কি নীল ষষ্ঠী করেছিস?”
ব্রাহ্মণী বলল, “সে কী মা? কই ও ব্রত তো আমরা জানি না।”

তখন মা ষষ্ঠী বললেন, “সমস্ত চৈত্র মাস সন্ন্যাস করে শিবপুজো করবে, তারপর সংক্রান্তির আগের দিন, সমস্ত দিন উপোষ করে সন্ধ্যার সময় নীলাবতীর পুজো করে নীলকণ্ঠ শিবের ঘরে বাতি জ্বেলে দিয়ে, মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করে তবে জল খাবে। ঐ দিনকে ষষ্ঠীর দিন বলে। যারা নীলষষ্ঠী করে তাদের ছেলে মেয়ে কখনও অল্প বয়সে মরে না।” এই বলে মা ষষ্ঠী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দেশে ফিরে গিয়ে খুব ভাল করে নীলষষ্ঠীর পুজো আরম্ভ করল। এরপর তাদের যতগুলো ছেলেমেয়ে হল, সবাই দিব্যি বেঁচে রইল। পাড়ার সকলে ব্রাহ্মণীর সুখ দেখে আর ঐ নীলষষ্ঠীর ব্রত জানতে পেরে সবাই নীলষষ্ঠীর ব্রত করতে লাগল। এই ব্রত করে সবারই ছেলেপুলে নীরোগ হয়ে বেঁচে রইল।

মূলতঃ এই চৈত্র বৈশাখ মাসে নানান বায়ুবাহিত, খাদ্যজনিত ও জলবাহিত অসুখের প্রকোপে, ঋতুপরিবর্তনের কারণে বহু মায়ের কোল খালি হয়, সেই অসুখের হাত থেকে বাঁচতে সর্বরোগহর বৈদ্যনাথ মহাদেবের আর জননী পরমাপ্রকৃতির ষষ্ঠ অংশের এক অংশ মা ষষ্ঠীর পুজো করে মায়েরা সন্তানের দীর্ঘ জীবন ও নীরোগ শরীরের কামনা করেন। নীল ষষ্ঠীতে মায়েরা শিবরাত্রির উপবাস ও ষষ্ঠী ব্রত করে যেমন ফলাহার করেন, তেমন ভাবেই পালন করেন। নীলষষ্ঠী যেহেতু নীলকণ্ঠ শিবের পুজো তাই

“আকন্দফুল, বিল্বপত্র, তোলা গঙ্গাজল/
এই পেলেই তুষ্ট হন ভোলা মহেশ্বর”

BANGLA

এছাড়া ধুতরো ফুল, ধুতরো ফল, পৈতে, সিদ্ধি, ঘি, মধু, দীপ বা মোমবাতি আর বেল দেওয়া হয় আর পঞ্চামৃত করে শিবের মাথায় ঢেলে চরণামৃত খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করা তো আছেই।

গ্রামাঞ্চলে নীলসন্ন্যাসীরা ও শিব-দুর্গার সঙেরা পূজার সময়ে নীলকে সুসজ্জিত করে গীতিবাদ্য সহযোগে বাড়ি বাড়ি ঘোরান এবং ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। নীলের গানকে বলা হয় অষ্টক গান। ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় সন্তানবতী হিন্দু রমণীরা সন্তানের কল্যাণার্থে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবপূজা করে সারাদিনের উপবাস ভঙ্গ করেন। নীলপূজা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদিয়া, হাওড়া; বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, বরিশাল এবং ত্রিপুরায় বঙ্গীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অধ্যুষিত এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। নদিয়া জেলার নবদ্বীপের গাজন উৎসবের একটি অংশ হিসাবে বাসন্তী পুজোর দশমীর ভোরে শিবের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

একটি বঙ্গীয় সংস্কৃতির অভিমতে নীল বা নীলকণ্ঠ মহাদেব শিবের অপর নাম। সেই নীল বা শিবের সাথে নীলচণ্ডিকা বা নীলাবতী পরমেশ্বরীর বিয়ে উপলক্ষ্যে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। কাহিনি অনুসারে, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পর শিবজায়া সতী পুনরায় সুন্দরী কন্যারূপে নীলধ্বজ রাজার বিল্ববনে আবির্ভূত হন। রাজা তাকে নিজ কন্যারূপে লালন-পালন করে শিবের সাথে বিয়ে দেন। বা সর ঘরে নীলাবতী শিবকে মোহিত করেন এবং পরে মক্ষিকারূপ ধরে ফুলের সঙ্গে জলে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন; রাজা-রাণীও শোকে প্রাণবিসর্জন দেন। নীলপূজা শিব ও নীলাবতীরই বিবাহ-অনুষ্ঠানের স্মারক।

নিম বা বেল কাঠ থেকে নীলের মূর্তি তৈরি হয়। চৈত্রসংক্রান্তির বেশ আগেই নীলকে মণ্ডপ থেকে নিচে নামানো হয়। নীলপূজার আগের দিন অধিবাস; অধিক রাত্রে হয় হাজরা পূজা অর্থাৎ বিয়ে উপলক্ষে সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ করা। হাজরা পূজায় শিবের চেলা বা ভূত-প্রেতের দেবতাকে পোড়া শোল মাছের ভোগ দেওয়া হয়। পরদিন নীলপূজার সময় নীলকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন লালশালু কাপড় পরিয়ে অন্ততপক্ষে সাতটি বাড়িতে নীলকে ঘোরানো হয়।

নীলসন্ন্যাসীরা একইরকম লাল কাপড় পরে পাগড়ি মাথায়, গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও হাতে ত্রিশূল নিয়ে নীলকে সঙ্গে করে এই মিছিল করেন। এদের দলপতিকে বলা হয় বালা। সাথে থাকে ঢাক-ঢোল, বাঁশী বাজনদারের দল এবং কাল্পনিক শিব-দুর্গার সাজে সঙেরা। গৃহস্থ মহিলারা উঠানে আল্পনা দিয়ে নীলকে আহ্বান করে বরাসনে বসিয়ে তার মাথায় তেলসিঁদুর পরিয়ে দেন।

বিয়ের পর নীলের গানে থাকে সংসারী হর-পার্বতীর কথা, শিবের কৃষিকাজ, গৌরীর শাঁখা পরা প্রভৃতি এবং ভিখারি শিবের সঙ্গে অন্নপূর্ণা শিবানীর দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানের কাহিনি। গানের প্রথম অংশ দলপতি বালারা এবং পরবর্তী অংশ অন্য নীলসন্ন্যাসীরা গেয়ে থাকেন।

গানের শেষে গৃহস্থরা সন্ন্যাসীদের চাল-পয়সা, ফল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপ দেয়। আদতে গ্রাম বাংলায় বেশী প্রচলিত এই শিব পার্বতীর বিয়ের নীলের উপবাস।
এরপর নীলের গান শুরু হয়:

“শুন সবে মন দিয়ে হইবে শিবের বিয়ে
কৈলাসেতে হবে অধিবাস।
(ও) তাতে নারদ করে আনাগোনা কৈলাসে বিয়ার ঘটনা
বাজে কাঁসী বাঁশী, মোহন বাঁশরী।”
“(ও) নারদ চলল গিরি রাজের গৃহেতে।
আর একদিনেতে শূলপাণি, নারদকে বলেন বাণী
শুনো নারদ শুনো আমার সাধ,
আমি দুই পাশে দুই বালিশ দিয়ে, মধ্যিখানে থাকি শুয়ে
উশিপুসি করে কাটাই রাত॥
(ও) নারদ চললো গিরি রাজের গৃহেতে॥
আর ওই শিব কয় কৈলাসে যেয়ে, দেখে এসেছি মেয়ে
শীঘ্র করো বিয়ের আয়োজন,
(ও) নারদ চললো গিরি রাজের গৃহেতে॥
চলিলেন নারদ মুনি, চলিলেন নারদ ধনি
উপনীত গিরি পুরে যেয়ে।
কইলেন মেনকা রানী, আইলেন নারদ মুনি

দেখা পেয়ে এল মুনির ঠাঁই।।
(ও) নারদ চললো গিরি রাজের গৃহেতে।।
শোনো ওগো গিরি রাজা, হইবা আমার আজা
জামাই তোমার হবে দিগম্বর॥”
বিয়ের ঘটক ভাগিনেয় নারদ মুনির কাছে শিব আর্তি জানান,
“ভাইগনা যদি উপকারী হও।
তবে বিয়া দিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও॥”

বিয়ের পর নীলের গানে থাকে সংসারী হর-পার্বতীর কথা, শিবের কৃষিকাজ, গৌরীর শাঁখা পরা প্রভৃতি এবং ভিখারি শিবের সঙ্গে অন্নপূর্ণা শিবানীর দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানের কাহিনি। গানের প্রথম অংশ দলপতি বালারা এবং পরবর্তী অংশ অন্য নীলসন্ন্যাসীরা গেয়ে থাকেন।

গানের শেষে গৃহস্থরা সন্ন্যাসীদের চাল-পয়সা, ফল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপ দেয়।

একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এই সময় থেকে যেহেতু গ্রীষ্মের দাবদাহ বাড়তে থাকে, তাই এই সময় ধরে চলে নানাবিধ ব্রত যা দিয়ে শরীর ঠান্ডা থাকবে, শীতলা পুজো, অশোকষষ্ঠী, অশোক অষ্টমী, নীলষষ্ঠী এবং চড়ক, এই উৎসব এবং ব্রতগুলোতে খাওয়া হয় মূলতঃ দেহ ঠান্ডা রাখার জিনিস যেমন সাবুমাখা, মুগডাল ভিজিয়ে মাখা, তরমুজ, ডাব, ফুটি, খরবুজা, শশা, দই, দইয়ের শরবত,চিনি লেবুর শরবত, কাঁচা আম ইত্যাদি জলীয় বা জলধারণকারী ফল। এতে শরীরের আর্দ্রতা সম্যক বজায় যাতে থাকে সেই প্রচেষ্টা থাকে।

আমাদের বার, ব্রত ইত্যাদির সঙ্গে জনজীবন যেহেতু জড়িয়ে আছে, তাই সবগুলোই কিছু না কিছু স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আরোগ্য ও সুস্থতা বজায় রাখার আয়োজন। জয় নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব 🙏🙏

॥সমাপ্ত॥